লতিফ সিদ্দিকীর অপসারণ

শাস্তি না দায়মুক্তি

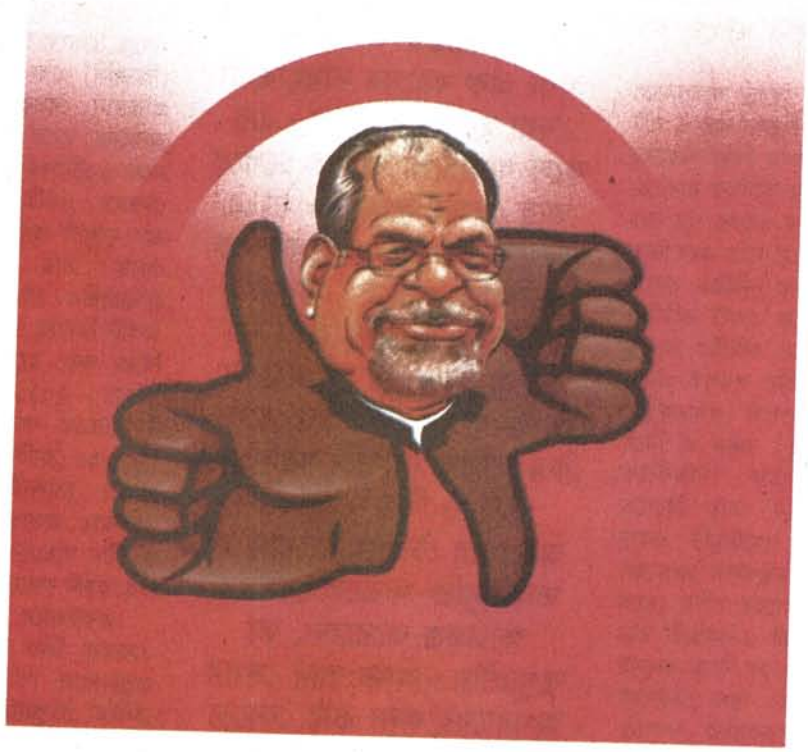

হাবিবুর রেজা

জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটেছে। ১২ অক্টোবর রোববার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন ভূইঞা নশ্চিত করেছেন, মন্ত্রিপরিষদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদের ১ ধারার গ উপধারা অনুসারে তার মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিয়েছেন। মাত্র ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে আওয়ামী লীগও দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করেছে তাকে, স্থগিত করা হয়েছে তার প্রাথমিক সদস্যপদও।

কেন বিদায় নিতে হলো আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে? ২৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের পালকি পার্টি সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্রে টাঙ্গাইল জেলা সমিতির মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিভিন্ন মন্তব্যের সূত্র ধরে যে উত্তেজনা দেখা দেয়, তার জের ধরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রীর পদ থেকে শেষ পর্যন্ত সরে যেতে হয়েছে তাকে। বলা হচ্ছে, তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে 'মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায়'। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ অক্টোবর বলেছেন, 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে কোনো বক্তব্য রাখা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। উনি (লতিফ সিদ্দিকী) পবিত্র হজসহ মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়ে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। সে জন্যে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু ধর্মহীনতায় নয়। সাংবিধানিক সকল নিয়মনীতি মেনেই আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।"

মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু তারপরও লতিফ সিদ্দিকীকে এভাবে সরিয়ে দেয়ার পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কাছে একজন মন্ত্রী

বা সাংসদকে অপসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ আসলে কী? এ প্রশ্ন আসছে, কেননা অনেক আগে থেকেই আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। তাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনাও হয়েছে, অথচ সেসব ক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা নীরবতা পালন করেছেন। এমনকি এখনো সেসব নিয়ে কিছুই বলা হচ্ছে না। এখন লতিফ সিদ্দিকীকে এভাবে সরিয়ে দেয়ায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাকে আসলে কি অপসারণ করা হলো নাকি দায়মুক্ত করা হলো?

মহাজোট সরকারের বিগত শাসনামলে আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তখন তিনি নিয়মের কোনো তোয়াক্কা না করে দুর্নীতির মাধ্যমে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে একের পর এক সরকারি সম্পদ পানির দরে বিক্রি করে দিয়ে বিত্তবৈভব করেছেন। তার দুর্নীতির তদন্তে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। সে কমিটির তদন্তে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রায় অর্ধশত প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জমাও পড়েছে। অথচ এ নিয়ে কখনই আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। মোটামুটি একক সিদ্ধান্তেই বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় চালাতেন লতিফ সিদ্দিকী। মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার ভয়ে তটস্থ থাকতেন। কোনো নিয়ম-কানুনই তিনি আমলে নিতেন না। বিনা টেন্ডারেই বিক্রি করে দিতেন সরকারের সম্পত্তি, ইজারা দিতেন, হস্তান্তর করতেন। এর ফলে সরকারকে তথা এ দেশের মানুষের লোকসান হয়েছে কোটি কোটি টাকা। লতিফ সিদ্দিকী তখন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'নীতিমালা বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ কর।' এ রকম গর্হিত কথা বলার পরও তখন তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। ওই সময় লতিফ সিদ্দিকী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন মতিঝিল মৌজার হোল্ডিং নং ১৭৬, আরএস দাগ নং ২৪৫৮, ঢাকা সিটি জরিপের দাগ নং-৩৩৩৯-এর আওতাভুক্ত ১১ কাঠা ১৩ ছটাক জমি নামমাত্র মূল্যে (এক কোটি এক লাখ এক হাজার একশত টাকা) দিয়ে দেন চট্টগ্রাম সমিতিকে। জমি দেয়ার সেই নোট শিটে লতিফ সিদ্দিকী তখন লিখেছিলেন, 'ব্যক্তিগত জীবনে আমি চট্টলা কন্যার পাণি গ্রহণ করেছি। মানবতার সেবায় তাদের সহযোগিতা করার নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে এটা করছি।' চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর স্ত্রী লায়লা সিদ্দিকী। তাই লতিফ সিদ্দিকী এ রকম একটি নিয়মবহির্ভূত অন্যায় কাজ করেছিলেন। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা অন্তত ৪৮টি সরকারি সম্পত্তি বিক্রি, ইজারা ও হস্তান্তর করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে ৪৮টি সম্পত্তি বিষয়ে তার অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে। তদন্ত কমিটি সে রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়, বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে যেসব সম্পদ এভাবে অন্যদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, সেগুলোকে আবার সরকারের অনুকূলে ফেরত নেয়া যায় কিনা তা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। তা ছাড়া কমিটি এসব রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিনামূল্যে বিক্রি, হস্তান্তর ও ইজারা দেয়ার কার্যক্রমে যেসব ব্যক্তি জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশও করেছে। কমিটির ওই রিপোর্টে বলা হয়, মহাজোট সরকারের পাঁচ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিএমসি, তাঁত বোর্ড, বিলুপ্ত বাংলাদেশ জুট করপোরেশন (বিজেসি) এবং বিজেএমসির মোট ৪৮টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে, অন্যদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২টিকেই হস্তান্তর করা হয়েছে বিনা টেন্ডারে। ৪৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০টিকে এর মধ্যেই পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তান্তর করা হয়ে গেছে। আর ১৭টি রয়েছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন। গাজীপুরের মসলিন কটন মিল একটি বিখ্যাত শিল্পকারখানা, কিন্তু এটিকে বিক্রি করা হয়েছে নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে। ২০১১ সালে রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেডের কাছে এটিকে নামকাওয়াস্তে মাত্র ১৩৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেয়া হয় লতিফ সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করা হয় মিলটিকে। মিলটির দায়দেনা ও মূল্যও তখন নির্ধারণ করা হয়নি যথাযথভাবে।

একইভাবে, একেবারেই কম দামে, এমনকি বিনা টেন্ডারে লতিফ সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে বিক্রি করা হয়েছে কুমিল্লার চিশতি টেক্সটাইল মিলটি। বিক্রি করা হয়েছে খুলনার দৌলতপুরের বিজেএমসির সম্পত্তি পাট বেলিং কেন্দ্র। লতিফ সিদ্দিকী সরাসরি নির্দেশ দেন এটিকে মাত্র পাঁচ কোটি পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করে দিতে। অথচ ২০০৯ সালে এটি যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন এ সম্পদের দাম ছিল ১৪ কোটি ৪২ হাজার ২১৩ টাকা।

চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের ফ্যারিলিন সিল্ক মিলসটি হস্তান্তর করা হয়েছিল শ্রমিক ও কর্মচারীদের কাছে সচল করে তোলার শর্তে। কিন্তু মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীর তা মনে ধরেনি। তিনি সেটি নীতিমালা ভঙ্গ করে বিক্রি করে দেন তৃতীয় পক্ষের কাছে। নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে অবস্থিত নিউ লক্ষ্মী কটন মিলও চুক্তি ভেঙে নীতিমালার তোয়াক্কা না করে তুলে দেয়া হয় তৃতীয় পক্ষের হাতে। বিনা টেন্ডারে বিক্রি করে দেয়া হয় নেত্রকোনার সাবেক জুট বোর্ড ও বগুড়ার সুরজমহল আগরওয়ালা মিল। কুড়িগ্রামের ঘেউরচাঁদ মাঙ্গিলালের জমি

লতিফ সিদ্দিকীকে যেভাবে অপসারণ করা হলো, তাতে শাস্তির বদলে তাকে বরং এক ধরনের দায়মুক্তিই দেয়া হলো বলা চলে। এর ফলে ধামাচাপা পড়তে চলেছে তার সেসব অপরাধ– যা এ দেশকে, এ দেশের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষের ধর্ম এমন ঠুনকো বিষয় নয় যে তা কারো বিরূপ মন্তব্যে ভেঙে পড়বে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে– কিন্তু লতিফ সিদ্দিকী আমাদের বস্ত্র ও শিল্প খাতকে, আমাদের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, তা অপূরণীয়। অথচ তার সেসব অপরাধের জন্য তার কোনো শাস্তিই হলো না। ধর্ম নিয়ে তিনি কী বলেছেন, তার ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে কি সরকারি দল, কি বিরোধী দল উভয় পক্ষই আড়ালে ফেলে দিয়েছে লতিফ সিদ্দিকীর সেইসব অপরাধ যা আসলে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে

বিক্রি করে দেয়া হয় নিষ্কণ্টক না করেই। এভাবে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী হিসেবে একের পর এক অনিয়মের পাহাড় গড়ে তুলতে থাকেন লতিফ সিদ্দিকী।

কমিটির ওই প্রতিবেদন আরো জানিয়েছে, চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের ন্যাশনাল কটন মিল বিক্রির আগে লতিফ সিদ্দিকী অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির মতামত নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি। বিনামূল্যেই তিনি হস্তান্তর করেন ঢাকার হাটখোলার ঢাকেশ্বরী কটন মিল। নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হয় নাসিরাবাদের ভ্যালিকা উলেন মিল। নীতিমালার তোয়াক্কা না করেই বিক্রি করে দেয়া হয় জামালপুরের আর সিম প্রেস হাউস। বেসরকারিকরণ কমিশনের আইন ও নীতিমালাকে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে দিয়ে লতিফ সিদ্দিকী হস্তান্তর করেন ফেনীর রানীর হাটের দোস্ত টেক্সটাইল।

লতিফ সিদ্দিকী মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন– সরকার তার জন্য তাকে অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গর্ব করে বলা হচ্ছে, 'আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।' এসব বলার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে কী বার্তা দিতে চাইছে, তাও সুস্পষ্ট নয়। তাহলে কি কোনোই শাস্তি হবে না আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের? প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা পড়ার পরও সেসব দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বরং রহস্যময় নীরবতা পালন করা হয়েছে। এখন যে পরিস্থিতিতে তাকে অপসারণ করা হলো, তাতে তার দেশে ফেরাও অনিশ্চিত। কেননা মানুষের অসন্তোষের মুখে পড়ার অজুহাতে তিনি এখন অবস্থান করছেন বিদেশেই। দেশে ফিরতে না পারলেও তিনি প্রবাসে অবস্থান করছেন নিরুপদ্রবেই। লতিফ সিদ্দিকী দেশে ফিরলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে, বিএনপি ও ইসলামী দলগুলো দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে– এ রকম সব কথাও শোনা যাচ্ছে। এ রকম অবস্থায় ১২ অক্টোবর ঘোষণা দেয়া হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদে আর নেই লতিফ সিদ্দিকী, নেই আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীতেও।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে ধূম্রজালের। কেননা লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে লতিফ সিদ্দিকী গত ১১ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রকে জানিয়েছেন, ডালাস থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গত ৬ অক্টোবর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা হয়েছে, কোনো পদত্যাগপত্র এসে পৌঁছায়নি। যদিও লতিফ সিদ্দিকী টেলিফোনে রিপোর্টারদের তার পদত্যাগপত্রটি পড়ে শুনিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এ পদত্যাগপত্র পাওয়ার কথা অস্বীকার করার কারণ কী হতে পারে? তাহলে কি ধরে নিতে হবে, পদত্যাগপত্রটি যেভাবে লেখা

মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু তারপরও লতিফ সিদ্দিকীকে এভাবে সরিয়ে দেয়ার পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কাছে একজন মন্ত্রী বা সাংসদকে অপসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ আসলে কী? এ প্রশ্ন আসছে, কেননা অনেক আগে থেকেই আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। তাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনাও হয়েছে, অথচ সেসব ক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা নীরবতা পালন করেছেন। এমনকি এখনো সেসব নিয়ে কিছুই বলা হচ্ছে না

হয়েছে, তা খুশি করতে পারেনি সরকারি মহলকে? নাকি তাকে অপসারণের ঘোষণা দেয়াটাকে রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি সুবিধাজনক বিবেচনা করা হয়েছে? রিপোর্টারদের কাছে লতিফ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, তিনি পদত্যাগপত্রে দুঃখ করেছেন এই মর্মে, তিনি তার নেতার মুখ রক্ষা করতে পারেননি; বরং তাকে বিব্রত করেছেন। এই আচরণের জন্য তিনি ক্ষমাও চেয়েছেন। মন্ত্রিসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তিনি লিখেছেন, 'আপনি আমাকে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর পদ থেকে অপসারণ করলেও দুঃখ পাব না; বরং মনে করব, যথার্থই হয়েছে। ব্যক্তির চেয়ে দল অনেক বড়। আমি তার যথার্থ প্রমাণ রাখতে চাই।' তিনি তার পদত্যাগপত্রে এ-ও লিখেছেন, তিনি এখন মুক্ত জীবন উপভোগ করছেন।

লতিফ সিদ্দিকীকে যেভাবে অপসারণ করা হলো, তাতে শাস্তির বদলে তাকে বরং এক ধরনের দায়মুক্তিই দেয়া হলো বলা চলে। এর ফলে ধামাচাপা পড়তে চলেছে তার সেসব অপরাধ– যা এ দেশকে, এ দেশের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষের ধর্ম এমন ঠুনকো বিষয় নয় যে তা কারো বিরূপ মন্তব্যে ভেঙে পড়বে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে– কিন্তু লতিফ সিদ্দিকী আমাদের বস্ত্র ও শিল্প খাতকে, আমাদের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, তা অপূরণীয়। অথচ তার সেসব অপরাধের জন্য তার কোনো শাস্তিই হলো না। ধর্ম নিয়ে তিনি কী বলেছেন, তার ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে কি সরকারি দল, কি বিরোধী দল উভয় পক্ষই আড়ালে ফেলে দিয়েছে লতিফ সিদ্দিকীর সেইসব অপরাধ যা আসলে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

লতিফ সিদ্দিকী ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাড়ি বেআইনিভাবে দখল করে নেয়ার মধ্য দিয়ে। তখন সেই বাড়ি উদ্ধার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল।

আচরণগত কারণেও লতিফ সিদ্দিকী বিভিন্ন সময় আলোচিত হয়েছেন। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সংসদের শুরুর দিকে এক অধিবেশনে সংসদের প্রথম সারিতে মন্ত্রী ও সরকারি দলের সাংসদদের অনুপস্থিতি দেখে তখনকার স্পিকার ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে লতিফ সিদ্দিকী তখন বলেছিলেন, 'স্পিকার হচ্ছেন জনগণের সেবক, তিনি প্রভু নন। কোনো সাংসদের পয়েন্ট অব অর্ডারেই শুধু রুলিং দিতে পারেন স্পিকার।' এরপর ২০১১ সালে পাট নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের উপস্থিতিতেই লতিফ সিদ্দিকী সে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের তুলোধোনা করেছিলেন, তাকে 'যথাযথ মর্যাদা' দেয়া হয়নি বলে। চলতি বছরের মার্চ

মাসের শেষের দিকে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে উপজেলা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের এক প্রকৌশলীকে লাঠির আঘাতে আহত করেন তিনি। আহত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিক্রয় ও বিতরণ) পূর্ণ চন্দ্র পালকে তখন চিকিৎসা নিতে হয় কালিহাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। তার অপরাধ ছিল কর্মস্থলে না থাকায় তিনি ঠিক সময়ে মন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতে পারেননি। তা ছাড়া দেখা করতে যাওয়ার পর তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন 'পকেটে হাত দিয়ে'।

লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, পাটমন্ত্রী থাকার সময় তিনি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন বাড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারে (জেডিপিসি) তিনি নির্বাহী পরিচালকসহ ১৮ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই জেডিপিসি ও ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ নামের দুটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায়। ২০১৩ সালে জেডিপিসির বার্ষিক সভায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানায়, এ দুটি প্রতিষ্ঠানই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণে ২০১৪ সালের জুনে ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ প্রতিষ্ঠানটিকে বিলুপ্তও করে দেয়া হয়। জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে টাঙ্গাইল জেলা কৃষক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খন্দকার মোখলেসুর রহমানকে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তখনকার পাটমন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী। এ পদে নিয়োগ পাওয়ার মতো ন্যূনতম যোগ্যতাও ছিল না মোখলেসুর রহমানের। জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দেয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। যোগ্যতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, পাট খাতে ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা, সঙ্গে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি অথবা ন্যূনতম স্নাতকোত্তর। পাট খাত তো দূরের কথা, শিল্প খাতে কাজেরও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না মোখলেসুর রহমানের। তার নিয়োগের বিষয়ে তখনকার মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী ২০১০ সালের ৩১ মার্চ নিয়োগ কমিটিতে লিখেছিলেন, 'নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোনোই প্রয়োজন নেই, খন্দকার মোখলেসুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হোক।'

এ রকম অনেক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে। বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন তিনি এভাবে। অনেকেরই ধারণা, বিদেশে হয়তো তিনি এর মধ্যেই প্রচুর অর্থ পাচার করেছেন। এখন বাকি জীবন বিদেশে আরামে আয়েশে জীবনযাপন করতে কোনো অসুবিধাই হবে না তার। বিস্ময়কর হলেও সত্য, সরকার কিংবা আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে পাওয়া এসব দুর্নীতি-অনিয়মকে হিসাবে নেয়নি। হিসাবে নিয়েছে ধর্মানুভূতিতে আঘাত করার বিষয়টিকে। ধর্মবাদী দল হিসেবে নিজেদের জাহির করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে কি আওয়ামী লীগ, কি বিএনপি। এভাবে আড়াল করা হয়েছে তার সেসব অপরাধকে, যা এ দেশকে, এ দেশের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে গেছে। দুর্নীতি-অনিয়মের জন্য লতিফ সিদ্দিকীকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি, শাস্তি পেতে হয়নি। তিনি আসলে এক ধরনের দায়মুক্তিই পেয়েছেন। সূক্ষ্মভাবে তাকে আসলে দায়মুক্ত করা হয়েছে।